**Pratidhwani the Echo**
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
**ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)**
**Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 153-159
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
**DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.059**

# সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘রাণু ও ভানু’ উপন্যাসে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ

**দেবাশীষ ঘোষ,** *গবেষক, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## Abstract

As a modern novelist Sunil Gangopadhyay has thought about Rabindranath all his life. The relationship between the predecessor and the successor has changed repeatedly. Sometimes the successor has wanted to deny the predecessor, and sometimes he has rediscovered it. And this changing experience of Rabindranath is reflected in his essays, poems, short stories, and novels.

Sunil's changing equation about Rabindranath is mostly from a literary perspective. At one time, he wanted to deny Rabindranath, but later he realized that 'there is no way without Rabindranath', although Sunil also had deep respect for Rabindranath, like everyone else of his time and contemporaries. He used to think 'If I could be a man like Rabindranath'.

Sunil’s Writing about Rabindranath is diverse. Rabindranath is present as a character in two of Sunil's novels. 'Ranu and Bhanu' and 'Prothom Alo'. The novel 'Ranu and Bhanu' (Bio-novel) that we are currently discussing in this article.

Ranu Adhikari (Mukhopadhyay) became very close to Rabindranath at one point. Rabindranath wrote countless letters to Ranu. Rabindranath became Ranu's 'Bhanudada'. Although the relationship between the two did not progress in a very straightforward way until the end. The equation of the relationship between Rabindranath and Ranu Adhikari is the main theme of the novel 'Ranu and Bhanu'. How Rabindranath the person is presented in the novel is our discussion.

In the novel, we see that just as the novelist Sunil has tried to capture Rabindranath's time by keeping a sense of history in mind, the human aspects of Rabindranath the person also come up in his writing. Moreover, the amount of imagination the novelist has resorted to, in most cases, the reader gains the same liberality and sophistication that is initiated into the reader by reading Rabindranath or Rabindranath's literature through the creation of fiction in the novel. As a result, Sunil's reinvention of Rabindranath Tagore has made Bengalis more inquisitive. Although it is admitted that many novelists in later years have not been able to maintain this balance. With excessive freedom, they have portrayed Rabindranath a character without paying attention to artistry or reality. From that point of view, Sunil's novel can be a benchmark from both sides - where the human aspect has become the main objective along with Rabindranath's artistic expression.

**Keywords-** Bio-novel, liberality, imagination, artistic expression, literary perspective, inquisitiveness, artistry

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সারাজীবন ভেবেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বারবার পূর্বসূরির সঙ্গে উত্তরসূরির সম্পর্ক বদলে গেছে। কখনো উত্তরসূরি অস্বীকার করতে চেয়েছেন পূর্বসূরিকে, আবার পুনরাবিষ্কার করেছেন। আর এই বদলে যাওয়া রবীন্দ্র-অভিজ্ঞতাই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাসে।[১]

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সুনীলের এই বদলে যাওয়া সমীকরণ বেশিরভাগটাই সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। একটা সময় যেমন রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন, পরে বুঝেছেন 'রবীন্দ্রনাথ ছাড়া গতি নেই' যদিও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সুনীলেরও সমসাময়িক আর সকলের মতই ছিল গভীর শ্রদ্ধা। ভাবতেন 'যদি রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ হতে পারতাম'

পূর্বেই উল্লেখ করেছি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখালেখি বিচিত্র। সুনীলের দুটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ চরিত্র হিসবে উপস্থিত। 'রাণু ও ভানু' ও 'প্রথম আলো'। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য 'রাণু ও ভানু' উপন্যাস।

রাণু অধিকারী(মুখোপাধ্যায়) একটা পর্বে রবীন্দ্রনাথের খুব ঘনিষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অজস্র চিঠি লিখেছেন রাণুকে। রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন রাণুর 'ভানুদাদা'। যদিও দুজনের সম্পর্ক শেষ অবধি খুব সরলরৈখিক পথে এগোয়নি। রবীন্দ্রনাথ ও রাণু অধিকারীর সম্পর্কের সমীকরণ 'রাণু ও ভানু' উপন্যাসের মূল উপজীব্য। উপন্যাসে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছেন তা আমাদের আলোচ্য।

উপন্যাসের সূচনা বালিকা রাণুর চিঠি দিয়ে। 'প্রিয় রবিবাবু' সম্বোধনের চিঠিটি বেশ মজার। চিঠিখানি রবীন্দ্রনাথ দুবার পড়লেন। পত্র লেখিকা পদবী দেননি, শুধু লিখেছেন নাম। ঠিকানা আছে অবশ্য, বেনারসের। কে রাণু? কত বয়স? চিঠির ভাষায় অল্পবয়সী বলেই মনে হয়। কিন্তু গম্ভীরভাবে সম্বোধন করেছে 'প্রিয় রবিবাবু।' আগে বা অন্তে শ্রদ্ধা বা প্রণাম জানাবার কোন বালাই নেই। 'আপনাকে আমাদের শোবার ঘরে শুতে দেব।'- এই অংশটি পড়ে কবির মুখে দাড়ি গোঁফের আড়াল থেকে ফুটে উঠল কৌতুকের হাসি।

'রাণু' নামে কবির নিজেরই এক কন্যাসন্তান ছিল। কিন্তু সে আর নেই। বুকভরা অভিমান নিয়ে সে চলে গেছে, পৃথিবী ছেড়ে। শ্রাবণ মাস। গুরুগুরু মেঘগর্জন শুরু হয়েছে। যেন ডঙ্কা বাজিয়ে রথে চেপে আসছে বর্ষা। হঠাৎ বাতাস বইছে প্রবল। কবি এসে দাঁড়ালেন ঝুল বারান্দায়। প্রথম বর্ষাকে বরণ করলেন তিনি। শান্তিনিকেতন থেকে খবর এসেছে চার জন ছাত্র খুবই অসুস্থ। ইনফ্লুয়েঞ্জা। যা মহাযুদ্ধের সময় থেকেই শুরু হয়েছে বলে কবি এর নাম দিয়েছে 'যুদ্ধ জ্বর।' শান্তিনিকেতনে পাঠাতে হবে ওষুধপত্র ও একজন ভালো ডাক্তার। এখন আর তিনি কবি নন, তিনি গুরুদেব, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সব ভার তার উপর। তার উপর ভরসা করে অভিভাবকরা ছেলেদের পাঠান। ওখানকার ছাত্রদের আবাসভবনটির ছাদ থেকে বর্ষার জল পড়ছে, মেরামত করা দরকার। একজন কলা-শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু টাকা? আশ্রম পরিচালনার জন্য টাকার সমস্যা রবীন্দ্রনাথকে চিন্তিত করে। রবীন্দ্রনাথের যে শুধু সাহিত্য রচনা করেন নি আশ্রমগুরু হিসাবে- পাশাপাশি তাঁকে কীভাবে বিভিন্ন কর্তব্য পালন করতে হতো, আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে হতো, এগুলি সুনীল অনুপুঙ্খ তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। বস্তুত ঔপন্যাসিক এখানে কবির মানবিক রূপটিকেই উপজীব্য করে তুলেছেন। এই কর্মকুশলতার মাঝে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জ্বরে পড়লেন। জ্বরের মধ্যেও মানুষের আনাগোনা লেগে আছে। নিজের অসুখের চেয়েও চারজন ছাত্রের অসুস্থতার জন্য তার উদ্বেগ বেশি। ডাক্তার পাঠানো হয়েছে। কয়েকদিন পর ছাত্রদের অবস্থার উন্নতির খবরে কবিও সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন।

আমরা রবীন্দ্রজীবনীকারদের ভাষ্যে দেখেছি রবীন্দ্রনাথ সাধারণত সরাসরি রাজনীতি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিনি কেবলেই ভাবুক কবি ছিলেন না। দেশ-কালের প্রয়োজনে তিনি কোন রকম ছুতমার্গকে প্রশ্রয় দেননি। মানুষের প্রয়োজনে রাজনীতির আঙিনাতেও এসেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সেই চিত্রও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'রাণু ও ভানু' উপন্যাসের দুটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক অবস্থানের চিত্র আমরা দেখতে পাই।

অ্যানি বেসান্তকে মাদ্রাজে অন্তরীন করার প্রসঙ্গ এসেছে। প্রসঙ্গসূত্রে ইতিহাসটা স্মরণ করে নেওয়া যাক। অ্যানি বেসান্ত ছিলেন ব্রিটিশ সমাজ-সংস্কারক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি আইরিস হোমরুল আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতে স্বশাসনের দাবিতে হোমরুল প্রতিষ্ঠা করেন।

**১৯১৬** সালের অ্যানি বেসান্তকে অন্তরীণ(গৃহবন্দী) করেছিলেন ইংরেজ সরকার। তিনি **১৯১৪** সালে হোমরুল লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। যার লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। ইংরেজ সরকার তার এই কার্যকলাপের কারণে তাকে অন্তরীণ করেন।

অ্যানি বেসান্তকে অন্তরীণ করার সংবাদে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। প্রস্তাব উঠল সেবারের কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে অ্যানি বেসান্তকে সভাপতি করা হোক। বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রস্তাব মেনে নিলেও বাংলার চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা গেল। এ প্রসঙ্গে চরমপন্থীরা রবীন্দ্রনাথের সাহায্য দাবী করলেন। রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন, 'এই মহীয়সী ইংরেজ রমণী ভারতে ইংরেজ সরকারের অপমানের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাকে সমর্থন করা অবশ্য উচিত। সরকার তাঁকে অন্তরীন করে অপমান করতে চাইছে এখনই তো ভারতবাসীর কর্তব্য কংগ্রেসের সভাপতি পদে তাঁকে বরণ করে সম্মান জানানো।'[২] একজন কবির পক্ষে রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকাই তো ভালো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাবেন এরকম সংকটের সময় তার নাম ব্যবহার করলে যদি একটা মহৎ কাজ হয় তখন কি প্রত্যাখ্যান করা যায়? কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি রাজি হলেন। কবির সম্মতিপত্র ছাপা হল সংবাদপত্রে।

অমনি গালাগালিও শুরু হয়ে গেল। নরমপন্থীদের হাতে অনেক কাগজ। তারা রবীন্দ্রনাথকে আখ্যা দিল হটকারী। অনেকে বলল নীতিহীন কিছু রাজনৈতিক নেতার পাল্লায় পড়ে শেষ বয়সে কবি অধঃপতনের দিকে যাচ্ছেন। কবিতা লেখা ছেড়ে এখন তাঁর ক্ষমতার লোভ হয়েছে।

বিভিন্ন নিন্দা কটুক্তি যেন এক একটি ধারালো তীর, বড় লাগে, বড় জ্বালা হয়। কবি বেশিক্ষণ সহ্যই করতে পারেন না। এক এক সময় ভাবেন ওসব পত্র পত্রিকা পড়বেনই না। তবু কেউ না কেউ ঠিক নজরে আনেন। এরকম সময়ে মনে কবিতা আসে না, গান আসে না। কোথাও পালাতে ইচ্ছা করে। অথচ পালাবার উপায় নেই। অনেক দায়িত্ব, অনেক কাজ। শান্তিনিকেতন আশ্রমের দায়িত্ব, জমিদারির দায়িত্ব।

এরকম অস্থির বাস্তবের মধ্যে এক ঝলক স্নিগ্ধ, শুভ্র বাতাসের মত বেনারস থেকে এল এক চিঠি। চিঠিটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের মন ভালো হয়ে গেল। একা একা হাসলেন কিছুক্ষণ। 'রাণু ও ভানু' উপন্যাসের চরিত্র রবীন্দ্রনাথ, বালিকা রাণুর কাছে মানসিক এক আশ্রয় পেয়েছে। এই চিত্র উপন্যাসে আমরা বেশ কয়েকবার পাব। রবীন্দ্রনাথ যখন বাহ্যিক জগতে ক্লান্ত যখন দরকার একটু মানসিক শান্তির, তখন বারবার তিনি রাণুর আশ্রয় নিয়েছেন।

দুজনের সাক্ষাৎ না হলেও রাণুর চিঠি রবীন্দ্রনাথের সেই প্রশান্তি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন, 'এই সাতান্ন বছরের জীবনে চিঠি তিনি কম পাননি, নিজেও লিখেছেন কয়েক সহস্র কিন্তু এমন ছেলেমানুষি ভরা নির্মল রসের চিঠি আগে কখনও উপভোগ করেননি।'[৩]

পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ড ঘটল। হাজার হাজার অস্ত্রহীন, শান্ত, নিরীহ মানুষের দল, তাদের মধ্যে নারী-শিশু-বৃদ্ধও আছে। নির্বিচারে তাদের গুলি করে মারা হল। রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত। কংগ্রেসের কোন নেতাই কিছু বলেন না। কিছু একটা অবশ্যই করা দরকার। অ্যান্ড্রুজকে তিনি দিল্লিতে গান্ধীজীর কাছে পাঠালেন একটা প্রস্তাব দিয়ে। গান্ধীজি রাজি থাকলে তিনিও দিল্লি চলে যাবেন তারপর ওরা দুজনে একসঙ্গে পাঞ্জাবে প্রবেশ করার চেষ্টা করবেন। পাঞ্জাবে বাইরের লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজিকে নিশ্চিত গ্রেপ্তার করা হবে। সে সংবাদ গোপন রাখা যাবে না। প্রচারিত হবে বিশ্বের সর্বত্র। এটাই হবে প্রতিবাদ। কিন্তু গান্ধীজী কবির প্রস্তাবে রাজি হলেন না। কবি দেখা করলেন চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে। চিত্তরঞ্জন দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চান। পাঞ্জাবের ঘটনার বাঙালিরা কেউ প্রতিবাদ করে না! কবি খুবই অবাক ও ক্ষুব্ধ হন।

পরদিন সকালে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এলেন। কবি একটা চিঠি প্রশান্তের হাতে দিলেন। প্রশান্তচন্দ্র কাগজ হাতে নিয়ে দেখলেন ইংরেজিতে লেখা একটি চিঠি। ভারতের বড়লাটকে সম্বোধন করে লেখা। ক্লান্তভাবে চেয়ারে মাথা হেলান দিলেন কবি। দুচোখে কোনে কালি কিন্তু ওষ্ঠে তৃপ্তির লেখা।রবীন্দ্রনাথ বললেন,'সারারাত বিছানায় যায়নি্ সারা গা জ্বলছিল। পাঞ্জাবির ঘটনায় কেউ কোনো প্রতিবাদ করবে না, এ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। গান্ধী আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন না, চিত্তকে গিয়ে বললাম কিছু একটা করো, সেও দেখি গা বাঁচিয়ে চলতে চায়। আমাকেই যদি সব দায়িত্ব নিতে হয়, তাহলে আর সভা ডেকে লোক জড়ো করার দরকার কী, নিজের কথা নিজেই জানাবো। ইংরেজ সরকার আমাকে খাতির করে নাইটহুড দিয়েছেন। যে সরকার আমার দেশের মানুষের উপর এরকম নৃশংস অত্যাচার করে, সেই সরকারের দেওয়া খেতাব আমার প্রয়োজন নেই, জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদে আমি নাইটহুড ফিরিয়ে দিচ্ছি।'[৪]

অ্যান্ড্রুজকে দায়িত্ব দেওয়া হল চিঠিখানি বড়লাটকে তার বার্তা হিসেবে পাঠানোর। প্রশান্তচন্দ্র কয়েকখানা অনুলিপি করলেন। রামানন্দবাবু ও অন্যান্য সংবাদপত্রে পাঠাবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ উঠে এলেন তিন তলায়। এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। এখন ওইসব গুরুতর চিন্তা মন থেকে একেবারে সরিয়ে ফেলে যদি কৌতুক হাস্য পরিহাস করা যেত। যদি কেউ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিত, সেরকম কেউ কাছে নেই। রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে ভেসে ওঠে লাবণ্যময়ী এক কিশোরীর মুখ। রাণুরা বেড়াতে গেছে আলমোড়া পাহাড়ে। রাণুর দুটো চিঠি জমে গেছে, তার পাহাড় ভ্রমণের বিবরণ ভরা। এই সময়ে রাণুর সঙ্গে কথা বলতে পারলে তাঁর মন পরিশুদ্ধ হতে পারত। রবীন্দ্রনাথ স্নান- প্রাতরাশের কথা ভুলে রাণুকে চিঠি লিখতে বসেন। রাণুকে চিঠি লিখে মনটা অনেক হালকা হয় কবির। আর ক্লান্তি বোধ নেই। রাণু বারবার অনুযোগ করে রবীন্দ্রনাথ কেন আর গল্প লেখেন না। এবার রাণু এলে আর তাকে বিমুখ করা যাবে না। একটা কিছু লিখতেই হবে রাণুর জন্য। তিনি আবার লিখতে বসে গেলেন।

এই ঘটনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যেমন দেখাচ্ছেন যে রবীন্দ্রনাথ বাহ্যিক জগতের ক্লান্তি ভুলতে রাণুকে আশ্রয় করেছেন, ঠিক তেমনি বাহ্যিক জগতের বিভিন্ন টানা-পোড়েন থেকে নিজস্ব সৃষ্টি জগতে ফিরছেনও রাণুরই কথা মাথায় রেখে।

উপন্যাসের প্রথমে সুনীল দেখিয়েছেন চূড়ান্ত অসহায় মুহূর্তে রাণু কীভাবে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। পুরো উপন্যাসে ধীরে ধীরে রাণু কীভাবে রবীন্দ্রনাথের মানসিক আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে তারই চিত্র এবং শেষে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ অভিমানে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান মাধুরীলতা বা বেলা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। বেলার স্বামী শরৎচন্দ্র, শ্বশুরবাড়ির লোকজন কবির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। বেলাও বাবাকে কেন জানি ভুল বুঝে অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে থাকে, কথা বলে না। তবু রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন অসুস্থ মেয়েকে দেখতে যান, প্রায় দিনই ফুল বা বেলার প্রিয় কিছু নিয়ে যান।এরকমই একদিন সকালে বেলাকে দেখতে গিয়ে কবি দেখলেন সদর দরজা হাট করে খোলা, বৈঠকখানায় ও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু মানুষ। সকলেই কথা বলছে খুব নিম্ন স্বরে, কবিকে দেখে সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেল। কবির পা মাটিতে গেঁথে গেল। স্থির মূর্তিবৎ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন একটুক্ষণ। তিনি বুঝে গেছেন, বেলা আর নেই। কবি আর উপরে উঠলেন না মৃত কন্যার মুখ দেখতে চান না তিনি। হাতে করে ফুল এনেছিলেন, বেলার প্রিয় চাপা ফুল, সেই ফুলের গুচ্ছ দরজার কাছে রেখে ফিরে গেলেন দ্রুত পদে। তার চোখে এক বিন্দু অশ্রু নেই। বুকের মধ্যে কিছু যেন চাপ বেঁধে আছে তিনি মনকে নির্দেশ দিলেন শান্ত হতে। মৃত্যুর কাছে তিনি কিছুতেই পরাভূত হবেন না। বহু প্রিয়জনের মৃত্যুর আঘাত তিনি পেয়েছেন। মনের ভিতর যাই চলুক বাইরে তিনি ধীর স্থির থাকার চেষ্টা করেন।

জোড়াসাঁকোয় এসে তিনি উদ্বিগ্ন রথী আর প্রতিমাদের খবরটি জানালেন অতি সংক্ষিপ্তভাবে। বেশি কথা বললেন না। উঠে গেলেন তিন তলার ঘরে। রথী জানে তার বাবার গড়ন। নিজে তো দুঃখের কোন চিহ্ন দেখাবেন না, অন্য কেউ তার সামনে দুঃথের উচ্ছ্বাস দেখালে বিরক্ত হবেন। মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করার একমাত্র উপায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকা। বিকাল পর্যন্ত কবি রইলেন নিজের ঘরে। তারপর হঠাৎ এক সময় ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বাইরে বেরোবার পোশাকে সজ্জিত হয়ে নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। কবি খানিকটা হেঁটে চিৎপুরের রাস্তায় এসে একটা ভাড়ার ঘোড়ার গাড়ি ধরলেন। তাতে বসে নির্দেশ দিলেন ভবানীপুরের দিকে যেতে। সেখানে পৌঁছে তিনি ল্যান্সডাউন রোডে একটি নম্বর খুঁজতে লাগলেন। একটু পরে থামলেন একটা বাড়ির সামনে। এইতো পঁয়ত্রিশ নম্বর। সদর দরজা বন্ধ তিনি মুখ তুলে জোরে জোরে ডাকতেন রাণু! রাণু! উপরের জানালা দিয়ে কে যেন মুখ বাড়াল, কবি ঘোরলাগা মানুষের মত বললেন রাণু কোথায়? আমি রাণুকে দেখতে এসেছি। দরজা খুলে গেল, প্রথম দৃষ্টিপাতে কবির মনে হল তিনি কোন অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছেন। সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে একটি পরী, না অপ্সরা? আপাতত মনে হয় দশ এগারো বছরের বালিকা, দুধে-আলতা গায়ের রং, সরল হরিণী চোখ, কোঁকড়া চুল।

কবির মনে হল এ বালিকা জন্ম-মৃত্যুর অতীত, কালের চিহ্ন ওকে স্পর্শ করে না। আজকের দিনটাতে এ বালিকা সরাসরি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে তাঁর হৃদয় জুড়িয়ে দিতে।

উপন্যাসের প্রথম দিকেই এই ঘটনা অঙ্কন করেছেন সুনীল। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর প্রথম সন্তানকে হারিয়ে ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড দুঃখে বিহ্বল, তখন তিনি রাণুর কাছে মানসিক আশ্রয় খুঁজছেন। তাঁর অশান্ত মনকে শান্তি দিয়েছে বালিকাটি। উপন্যাসের কাহিনিতে আমরা দেখি মোটামুটি সকালের শেষ ভাগ থেকে বিকাল অব্দি কবি একাই ছিলেন একটি ঘরে কবি। নিজেই নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে স্থির করার চেষ্টা করছিলেন। তারপর তার মনে হয় রাণু নামের যে বালিকাটির সঙ্গে তার কয়েকটি চিঠি আদান-প্রদান হয়েছে সেই সরল বালিকাটি এই মুহূর্তে সে কবির 'হৃদয় জুড়িয়ে দিতে পারে'।

পূর্বে উল্লেখিত অ্যানি বেসান্তের ঘটনা প্রসঙ্গে, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ করেছি রবীন্দ্রনাথ যখন বাইরের জাগতিক বিষয়ে বিক্ষুব্ধ, বিপর্যস্ত, যখন মনকে শান্ত করতে পারছেন না তখনই তিনি রাণুর কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। রাণু যেন ঠান্ডা বাতাসের মতো কবির মনকে প্রশান্ত করছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনে অনেক মৃত্যুশোক পেয়েছেন, জাগতিক অনেক লাঞ্ছনা, অপমান তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে।

রাণু নামের বারিকা তাঁর নির্মল সরলতার দ্বারা কবিকে মানসিক প্রশান্তি দান করেছিল। উপন্যাসে সুনীল রাণুর এই মানসিক আশ্রয় হয়ে ওঠাকে সুন্দর অঙ্কন করেছেন তার ঔপন্যাসিক দক্ষতায় ।

রবীন্দ্রনাথ ও রাণুর সম্পর্কের চিত্র আঁকতে গিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে এসেছে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ কেবল সাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। পালন করতে হতো বহু কর্তব্য। বিদ্যালয়টি ছিল কবির প্রাণের খুব কাছের। বিদ্যালয় পরিচালনা করতে রবীন্দ্রনাথের সহ্য করতে হয়েছে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত। একজন কবি বা সাহিত্যিকের কাছে এইসব ব্যাপার সামলে চলা খুব সহজ কাজ ছিল না। সাহিত্যিক হিসাবে সুনীল নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের এই সত্তার দিকটি ভালোভাবে বুঝে থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সম্পর্ক নিয়ে বর্তমানে অনেকে বিভিন্ন কল্পকাহিনী রচনা করেছেন। এমনকি উভয়ের যৌনতার সম্পর্ক অঙ্কিত হয়েছে। যদিও রবীন্দ্র-জীবনী বা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্মৃতিকথাগুলোতে এরকম কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। সুনীল এখানে রবীন্দ্র-কাদম্বরী সম্পর্কে সেরকম কোন দিকে নিয়ে যায়নি। রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারাজীরন ধরেই কাদম্বরী সম্পর্কে সারা জীবন ধরে যে সব কথা বলেছেন সুনীল সেই ধারণাকেই মান্যতা দিয়েছেন।

উপন্যাসে 'রক্তকরবী' নাটকের কথা আছে। 'রক্তকরবী' নাটক রচিত হওয়ার সুন্দর এক প্রেক্ষিত রচনা করেছেন। উপন্যাসের রবীন্দ্রনাথ শিলং বেড়াতে গেছেন, রাণুও সঙ্গী। একদিন রাণু জানতে চাইল কী লিখছেন। কবি জানান একটি নাটক লিখছেন। বললেন, 'রাণু এই লেখাটার জন্য তোমার কাছাকাছি থাকা যেন বেশি দরকার। এক একবার তোমার মুখখানা দেখি, আর অনেক কিছু মনে পড়ে যায়... তুমি এই নাটকের প্রাণ। তুমিই হিরোইন। তোমাকে নিয়েই লিখছি।'[৫]

রবীন্দ্রনাথ একদিন রাণুকে 'রক্তকরবী' নাটকের 'তোমায় গান শোনাবো, তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো' গানটি শোনালো। গান শেষ হবার পরে দুজনেই স্তব্ধ। কেটে যেতে লাগলো পল অনুপল। তারপর রাণু গানের 'দুঃখজাগানিয়া' কথাটির মর্ম বুঝতে চাইলে, রাণু যে কবির তুলনায় কত সামান্য সে কথা বলল। কবি বলল, 'না রাণু তুমি সামান্য নও। হয়তো তুমি বুঝতে পারো না, কতখানি মাধুর্য তুমি আমাকে দাও।'[৬] রাণু বলল, 'আমি আর কী দিই। আমি তো পাই। সাত রাজার ঐশ্বর্যের চেয়েও বেশি। আমি কি বুঝি না যে তুমি কত বড়, কত ব্যস্ত, কত কাজের মানুষ। তবু যে তুমি আমার ছেলেমানুষি সহ্য করো-কবি রাণুর হাত ধরে বললেন,তুমি যে তুমিই ওগো সেই তব ঋণ। আর কেউ বুঝবে না, তোমার ভালোবাসা আমার কাছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারের চেয়েও বেশি।'[৭]

রাণু তার সরলতা, সৌন্দর্য, ছেলেমানুষি দিয়ে যে মাধুর্য দান করেছিল তা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে উজ্জীবিত করেছিল। রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি চিঠিতে এই স্বীকারোক্তি আছে। সুনীল তাঁর উপন্যাসে এই বিষয়টিকে কাহিনির মধ্যে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন।

ধীরে ধীরে রাণু বড় হতে লাগলো। সুন্দরী রাণুর পাণিপ্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগলো। রাণুর বাবা-মা ও রাণুর বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা শুরু করলেন। কবি বেদনার সঙ্গে মেনে নিয়েছেন রাণুকে অন্য একজন পুরুষের হাতে সঁপে দিতেই হবে। তা বলে কি চিরবিচ্ছেদ হবে রাণুর সঙ্গে? রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা রাণুর বাবা হয়তো তড়িঘড়ি করে এমন কোন পাত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ করবেন, যে রাণুকে নিয়ে যাবে দূর প্রবাসে। বিয়ে হোক, তবু রাণু থাকুক কাছাকাছি, ইচ্ছা কবির। সেজন্য এমন একটি ভালো বংশের, শিক্ষিত রুচিবান পাত্র বাছতে হবে, যে রাণুকে ভালবাসবে, মর্যাদা দেবে, আর কবির প্রতিও শ্রদ্ধাশীল, যে কবির সঙ্গে রাণুর যোগাযোগ রক্ষা

করতে বাধা দেবে না। এ ভার কবি নিজেই নেবেন ভাবেন। কিন্তু কাজের চাপে এদিকে মনোযোগ দিতে সুযোগ পান না। বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত কবি। সদলবলে যাত্রা করলেন চীন। সেখান থেকে জাপান ঘুরে দেশে ফিরবেন প্রায় পাঁচ মাস পরে।

রাণুর জন্য পাত্র নির্বাচন এবং পাকা কথা হয়ে গেল কবির অনুপস্থিতিতে। বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বীরেন মুখোপাধ্যায় পাত্র। কবিকে না জানিয়েই সব ঠিক হয়ে গেল এজন্য অপরাধবোধ হলো রাণুর মায়ের। সমস্ত খবর জানিয়ে চিঠি লেখা হল কবিকে।

এর মধ্যে ঘটে গেল এক বিশ্রী কান্ড। রাণুর মা ও রাণুর হবু শাশুড়ির কাছে কিছু উড়ো চিঠি পৌঁছালো, গুপ্তনামা নিন্দুক রাণুর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করার চেষ্টা করল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই রাণুর ভাবি শাশুড়িকে চিঠি লিখলেন। রাণুর নিষ্কলুষ চরিত্র সম্পর্কে আশ্বস্ত করলেন। সস্ত্রীক রাজেন মুখার্জি কবির সঙ্গে দেখা করলেন। কবি ব্যাকুল ভাবে তাদের বোঝালেন। শেষ পর্যন্ত বিবাহের কোন বাধা রইল না।

রাণুর বিয়ে হল খুব জমকালোভাবে। যদিও রাণুকে বিদায় দিতে রবীন্দ্রনাথ কতটা মানসিক আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন তা সুনীল নির্মাণ করেছেন উপন্যাসের শেষে চারটি রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহার করে। এখানে উল্লেখ্য সুনীল গানগুলির নির্বাচিত পংক্তি ব্যবহার করেননি, পুরো গানই ব্যবহার করেছেন। গানের প্রতিটি পংক্তি যেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কান্নাকে পাঠকের মনে দেগে দেয়।

উপন্যাসটিতে আমরা দেখতে পাই ঔপন্যাসিক সুনীল যেমন ইতিহাসবোধকে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথের কালকে ধরার চেষ্টা করেছেন, পাশাপাশি ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মানবিক দিকগুলিও তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে। তাছাড়া ঔপন্যাসিক যতটুকু কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করে যেরকম একপ্রকার উদারতা ও পরিশীলনের দীক্ষা হয় পাঠকের, সেইদিকটিও তাঁর কল্পসৃজনে ফুটে উঠেছে। ফলে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সুনীলের এই নবরূপায়ণ বাঙালিকে আরও জিজ্ঞাসু আরও পরিণমিত করে। যদিও একটি কথা স্বীকার্য যে পরবর্তীকালে অনেক ঔপন্যাসিক এই সমতা রাখতে পারেননি। অতিরিক্ত স্বাধীনতায় একটি সংস্কৃতির ধারক একটি চরিত্রকে কেবলই স্খলিত রূপাবয়বে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পকুশলতার কিংবা বাস্তবতার তোয়াক্কা না করে। সেদিক থেকে সুনীলের এই উপন্যাসটি উভয়দিক থেকেই মানদণ্ড হতে পারে- যেখানে রবীন্দ্রনাথের শিল্পকুশল অভিব্যক্তির পাশাপাশি মানবিক দিকটিই মূল উদ্দিষ্ট হয়ে উঠেছে।

## গ্রন্থপঞ্জি:

১. আগ্রহী পাঠক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার এবং পুনরাবিষ্কার' (দে'জ পাবলিশিং) বইটি দেখতে পারেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সুনীলের যাবতীয় লেখালেখির সংকলন গ্রন্থটি।
২. গঙ্গোপাধ্যায়, রাণু ও ভানু, পৃ. ১৩।
৩. গঙ্গোপাধ্যায়, রাণু ও ভানু, পৃ. ১৭।
৪. গঙ্গোপাধ্যায়, রাণু ও ভানু, পৃ. ৭৫.
৫. গঙ্গোপাধ্যায়, রাণু ও ভানু, পৃ. ১৪৮.
৬. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, রাণু ও ভানু, পৃ. ১৫৩.
৭. গঙ্গোপাধ্যায়, রাণু ও ভানু, পৃ. ১৫৩.